আজকের কাগজ

তারিখ 08 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

৮ই সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল

সাক্ষরতা কর্মসূচী এতই বিশাল যে, সমাজের ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং বেসরকারী সংস্থা ও সরকার বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এর সফল বাস্তবায়ন অসম্ভব। ফলে এর জন্যে প্রয়োজন একটি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ–জাতীয় আন্দোলন। এতে থাকতে হবে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত দক্ষ ও আত্মনিবেদিত কর্মী বাহিনী।

আটই সেপ্টেম্বর বার বার ঘুরে আসে প্রতিবছর একটি প্রতিশ্রুতি দিবস হিসাবে। এবারও পথ-যাত্রা হবে, সেমিনার-ওয়ার্কশপ হবে। সুধীমহল দেশে সাক্ষরতার বর্তমান দুর্গতি লক্ষ্য করে অদূর ভবিষ্যতে এ হার বৃদ্ধিকল্পে নতুন প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার একুশ বছর পরও শিক্ষা ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তার হিসাব নেয়ার সময় কি এখনও আসেনি? একটা সময় ছিল যখন শিক্ষা ছিল মুষ্টিমেয়ের অধিগত, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্যকলাপের ফল। এখন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ এবং তার যথাযথ প্রয়োগ যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই প্রাচীন ঐতিহ্যের নামে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে বা শিক্ষাখাতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে এশীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। পূর্ব এশীয় দেশসমূহে যেখানে জাতীয় আয়ের আনুমানিক ৩.৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়, সেখানে বাংলাদেশে বরাদ্দ হচ্ছে আনুমানিক মাত্র ২ শতাংশ। বর্তমান অনুন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কাটছাঁট করে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি সম্ভব এবং তা যুক্তিসঙ্গতও বটে।

দেশে কিশোর-যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে নিরক্ষরের পরিমাণ প্রায় ৪.৮০ কোটি। অন্যদিকে ৬-১০ বছরের প্রাথমিক স্কুল গমনোপোযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ১.৫৩ কোটি। চলতি হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৭৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং ৫ বছরমেয়াদী কোর্সে প্রায় ৬৫% ঝরে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষা খাতের প্রায় ৫০ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে। তবুও স্কুল নির্মাণ ও স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া এক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। জানা যায়, এ অঞ্চলে কাঠামোগত প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হয় প্রায় ১৭০ বছর আগে। তারও পূর্বে শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন ছিলো। তখন গুরুগৃহে, পাঠশালায় বা টোলে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করতো। তাছাড়া ছিলো বৌদ্ধ বিহার, মসজিদভিত্তিক মক্তব বা মাদ্রাসা যেখানে সর্বসাধারণের শিক্ষার সুযোগ ছিলো বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে সে সুযোগ শাসকশ্রেণী ও বিত্তবানদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ শাসকরা একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সে ব্যবস্থায় পরাধীন ভারতে একটি বশংবদ শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়, যারা রক্তে আর বর্ণে ভারতীয় হলেও স্বভাব, রুচি ও আচার-আচরণে ছিলো ইংরেজ এবং তারাই শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীর দায়িত্ব পালন করতো। তারপর থেকে এদেশে এলিটিস্ট এডুকেশন চলছে। তাই আজও একই শ্রেণীর হাতেই শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে, দীর্ঘ ২০ বছর (১৯৫১-৭১) সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১ শতাংশ (২১% থেকে ২২%)। তারপর ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৬ শতাংশ। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এ দশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৮ শতাংশ (২৯.২% থেকে ৩১%)।

তাই একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং দেশবাসীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে শিক্ষা কাঠামোকে সংশোধন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকার বার বার বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সব সময়ে অতিমাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপরে নির্ভরশীল থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাক্ষরতা কর্মসূচীর সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, মোদ্দা কথা হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় একটি বিনিয়োগ। কাজেই দেশে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন বিবেচনায় শিক্ষাখাতে ক্রমাগত আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম বার বার ব্যাহত হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে বর্তমান পদ্ধতি চালিয়ে গেলে সার্বিক সাক্ষরতার অবস্থা উন্নতির সম্ভাবনা কম। বিষয়টিতে আরও গভীর ভাবনা-চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

স্পষ্টতঃ বাংলাদেশের স্কুলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি বিগত কয়েক দশক ধরে সৃজনশীলতা, মননশীলতা ও জনগণের অংশগ্রহণ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে এসে অতিমাত্রায় সংগঠন, কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হয়ে পড়েছে। বিদ্যার্জন মূল্যায়ন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ও একঘেয়ে হয়ে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংগতিহীন হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ এটি একটি অপচয়ী ও অনুৎপাদনশীল ব্যবস্থা, যার প্রকৃতি অতিমাত্রায় পোশাকী এবং উচ্চবিত্তদের জন্য নির্ধারিত বলা অযৌক্তিক হবে না।

যাই হোক, আমাদের দেশের অন্যতম দুর্ভাগ্য হলো মোট প্রায় ১১ কোটি জনসাধারণের মধ্যে প্রায় ৬৯ শতাংশ এখন অক্ষরজ্ঞানহীন। এর মধ্যে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এবং আনুমানিক ৪০ বছরের অধিক বয়সের জনগণকে বাদ দিলেও ১৫-৩৫ বছরের কর্মক্ষম আনুমানিক ৫.৫ কোটি জনগোষ্ঠি নিরক্ষর। বিদ্যালয়ের অনাকর্ষণীয় পরিবেশ, ঝরে পড়ার উর্ধ্বহার, অদক্ষ ও অপটু শিক্ষক এবং জ্ঞানার্জনে নিম্নমান পরিবেশ চলতে থাকলে এবং জনসংখ্যা চলতি হারে বাড়তে থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ নিরক্ষরের পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে ৭.৫-৮ কোটিতে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্যে শিক্ষা' অর্জনে সরকারের অঙ্গীকার শ্লোগানে পরিণত হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কাজেই সরকারের এ প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে হলে কৌশল পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশের জনগোষ্ঠির মাত্র ১৭ শতাংশ বা প্রায় ১.৮ কোটি শিক্ষার্থী ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা সকল পর্যায়ের ৭৮,৯০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ শিক্ষার্থীরা ৬-২২ বছর বয়স সীমায় সাধারণভাবে সামাজিক ও পুঁথিগত বিদ্যার্জনে বন্দিদশায় থাকার কথা কিন্তু বাস্তব চিত্র হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে, শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের আয়ত্ত বহির্ভূত অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে জনগোষ্ঠির বাকি ৮৩ শতাংশ বিভিন্ন বয়সের জনগণের জন্যে কোনো বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। কাজেই এ বিরাট জনগণ এক অনিশ্চিত জীবনধারণ করছে।

এ স্বল্প পরিসরে হলেও সাক্ষরতা দিবসের আলোকে সরকারের গণশিক্ষা কর্মসূচী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৮০ সনে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও উৎসাহে ১৫-৪৫ বয়ঃক্রমের জন্যে এ ব্যবস্থা হাতে নেয়া হলেও ১৯৮২ সনে সরকার পরিবর্তনের পর গণশিক্ষা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তাই ১৯৮০-৯০ সালের মধ্যে অর্থাৎ ১০ বছরে আনুমানিক মাত্র ৭ লাখ জনগোষ্ঠি সাক্ষরতার ছায়াতলে এসেছে। এ কার্যক্রমে প্রায় একশত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জড়িত ছিল।

চলতি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ২৩৮০ কোটি টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রয়েছে, যার ৯৮ শতাংশ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হবে। অথচ বৃহত্তর জনগোষ্ঠি তথা ৮৩ শতাংশের জন্যে রয়েছে ২ শতাংশের কম উন্নয়ন বরাদ্দ- তাও আবার এক দুর্বল কাঠামোর আওতায়। মন্দের ভাল সম্প্রতি সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা নামক আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ ও উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগে বিলম্ব হচ্ছে। ফলে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজন প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। প্রচলিত ও প্রথাগত শিক্ষা থেকে ভিন্নতর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে যেখানে শ্রেণীবিন্যাস, কালানুক্রম ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেখানে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে রয়েছে মুক্ত পরিবেশ এবং তুলনামূলক নমনীয় কাঠামো। এ প্রসংগে বেসরকারী সংস্থা সমূহের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অনানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা বা সাক্ষরতা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এনজিওদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গ্রামের বঞ্চিত জনগোষ্ঠি অনগ্রসর উপজাতি, শহরের বস্তিবাসী ও শ্রমজীবী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অধিকতর লাভবান হবার সুযোগ থাকে। কাজেই, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সময়সূচীর নমনীয়তা ছাড়াও দেশের সর্বত্র মসজিদ, মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে।

সাক্ষরতা কর্মসূচী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকলেও তথ্য, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, জনশক্তি, কৃষি প্রভৃতি মন্ত্রণালয় ও তৎসংলগ্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজ, স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বেসরকারী সংস্থা শিক্ষক-অভিভাবক এবং প্রচার মাধ্যম যথা মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

সাক্ষরতা কর্মসূচী এতই বিশাল যে, সমাজের ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং বেসরকারী সংস্থা ও সরকার বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এর সফল বাস্তবায়ন অসম্ভব। ফলে এর জন্যে প্রয়োজন একটি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ-জাতীয় আন্দোলন। এতে থাকতে হবে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত দক্ষ ও আত্মনিবেদিত কর্মী বাহিনী। তাছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সমর্থনপুষ্ট একটি বাস্তবভিত্তিক "অ্যাকশন প্ল্যান"ও অবশ্যই প্রয়োজন। আর বিলম্ব নয়। এখনই শুরু করতে হবে। অন্যথায় এ বছরের প্রতিশ্রুতি প্রতিবারের মতো বিফলে যাবে।

নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল ঃ মহাপরিচালক, বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়।